হোমিওপ্যাথিক কেইস টেকিং
ও
ফলো-আপ ম্যানেজমেন্ট

ডা. শাহীন মাহমুদ

বি ষ য় সূ চি

১। প্রকাশকের কথা ৯
২। ভূমিকা ১১
৩। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কেইস টেকিং ১৭
৪। সফল কেইস রেকর্ডের লক্ষ্যে শিক্ষামূলক প্রস্তুতি ২৭
৫। কেইস রেকর্ডে রোগীদের যে তথ্যগুলো অপরিহার্য ৫৩
৬। শিশুদের কেইস টেকিংয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় ৭১
৭। একিউট রোগের চিকিৎসায় করণীয় ৮১
৮। মহামারীর কেইস টেকিং ও চিকিৎসার নিয়মাবলী ৮৪
৯। ফলো-আপ রিপোর্টিং ৮৯
১০। ফলো-আপ ম্যানেজমেন্ট ৯৬
ক) ডা. হেরিংয়ের আরোগ্যনীতি ৯৭
খ) ডা. কেন্টের ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পর রোগীর সম্ভাব্য ফলাফল নির্ণয় ১০১
১১। ডা. জর্জ ভিথোলকাসের ঔষধ প্রয়োগে সৃষ্ট বাইশটি অবস্থাচিত্র ১০৬
১২। পঞ্চসহস্রতমিক শক্তির ঔষধ ব্যবহারের পর পর্যবেক্ষণ ১১৬
১৩। কেইস টেকিংয়ের ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ পরামর্শ ১২০
১৪। কেইস টেকিংয়ে যে কাজগুলো অবশ্যই পরিহার করতে হবে ১২৪
১৫। কেইস নেয়া শেষে, নিজেকে যে প্রশ্নগুলো করতে হবে ১২৭
১৬। কেইস টেকিংয়ের ব্যাপারে স্মরণযোগ্য কিছু কথা ১৩০
১৭। যে বিষয়গুলো নিয়ে রোগীকে সতর্ক করে দিতে হবে ১৩৩
১৮। রোগীদের প্রশ্ন ও সঠিক জবাব ১৩৬
১৯। কেইস রেকর্ড ফর্মের নমুনা ১৪২
ক) সাধারণ কেইস রেকর্ড ফরম ১৪৬
খ) শিশুদের জন্য বিশেষ কেইস রেকর্ড ফরম ১৭৯
২০। শেষকথা ১৮৪

ভূমিকা

পৃথিবীতে বহু শাস্ত্র আছে- যার তাত্ত্বিক জ্ঞানের সাথে ব্যবহারিক কাজের বিস্তর পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়। পড়াশুনার বহু ক্ষেত্রে পেশাগত জীবনে সেই পড়ে আসা জ্ঞানগুলো কেবল আক্ষরিক পাণ্ডিত্য হিসাবে যোগ্যতার প্রমাণ হয়ে থেকে যায়। একেবারে কাজে লাগে না তা বলছি না, তবে তাতে যতটা সম্পর্ক থাকে হিসাব-নিকাশের বা ভিন্নধর্মী কর্মকাণ্ডের সাথে, তার চেয়ে বহু কম সম্পর্ক থাকে পাঠ্য-বিষয়বস্তুর সাথে।

আর এক্ষেত্রে একদমই অনন্য হোমিওপ্যাথি! হোমিওপ্যাথি এমন একটি শাস্ত্র- যেখানে তাত্ত্বিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই, কোনো ফারাক নেই। যারা প্যাটেন্ট, বায়োকেমিক, মাদার-টিংচার নির্ভর চিকিৎসক তাদের কাছে কথাটি কিছুমাত্রায় ভুল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যারা প্রকৃত ধারায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন, তারা জানেন- হোমিওপ্যাথিক তত্ত্ব ও দর্শনকে যে চিকিৎসক যত বেশি অনুসরণ করতে পারেন- তার প্রকৃত সফলতা, সত্যিকারের আরোগ্যের হার তত বেশি। তিনি জ্ঞানে ও গুণে তত বেশি সমৃদ্ধ হন।

আর হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রের ব্যবহারিক ক্ষেত্রের দরজাটি হচ্ছে- কেইস টেকিং। একজন শিক্ষার্থীকে কেইস টেকিং আয়ত্ত্ব করতে হলে, একদিকে যেমন তাকে জানতে হয় হোমিওপ্যাথিক দর্শন- যা আসলে কেইস টেকিংয়ের ভিত্তি, জানতে হয় সিম্পটোমাটোলজি, এনাটমি, ফিজিওলজি, মনোবিজ্ঞান, পরিবেশ ও সমাজবিজ্ঞানসহ জ্ঞানের বহু শাখাকে। অন্যদিকে তাকে অর্জন করতে হয় প্রশ্নকৌশল, ধৈর্য, সত্যকে বের করে আনার দক্ষতাসহ আরো বহুবিধ ব্যবহারিক গুণ। মূলত একজন শিক্ষার্থী প্রকৃত ধারায় কেইস টেকিং করবে কি করবে না- এই সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করে তার সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ। সে কি হবে? সে কি প্রকৃত আরোগ্যকারী চিকিৎসক হবে? সে কি হোমিওপ্যাথিক জ্ঞানশাস্ত্রের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করবে? নাকি কেবল থেরাপিউটক অ্যাপ্রোচকে ভিত্তি করে কেবল সর্দি-কাশি-ফোঁড়া সারিয়ে যাবে?

সফল কেইস রেকর্ডের লক্ষ্যে শিক্ষামূলক প্রস্তুতি

আগের অধ্যায়েই বলে এসেছি, সফল হোমিওপ্যাথিক কেইস রেকর্ড করা একদিনে শেখার কর্ম নয়- দিনের পর দিন সঠিক পথে, সঠিক উপায়ে প্রচেষ্টা করতে থাকলেই কেবল ক্রমান্বয়ে তা অর্জিত হতে পারে। মূলত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোর অন্যতম হচ্ছে যথাযথ কেইস টেকিং করা। বলা হয়, উপযুক্ত কেইস টেকিং করা মানে আরোগ্যের দিকে অর্ধেক পথ পাড়ি দেয়া। কিন্তু এই মহাগুরুত্বপূর্ণ কাজটি আয়ত্ত্ব করতে কিছু গুণাবলী ও মৌলিক বিষয়ের দিকে লক্ষ রেখে এগুতে হয়। প্রয়োজন হয় কিছু পূর্ব-প্রস্তুতির। কেউ যদি শুরুতে বিষয়গুলো না জানে, হয়তো সময়ের অপচয় করে, ঠেকে ঠেকে ও ঠকে ঠকে জেনে নেবে- যেভাবে মহাত্মা হ্যানিমান বা আমাদের শাস্ত্রের ভিত্তি যারা স্থাপন করে গেছেন- তারা শিখেছেন। কিন্তু সেই একই দুর্দশা আমাদের ভোগ করার তো কোনো প্রয়োজন নেই। প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে ধারণা নিয়ে আমরা শুরু থেকেই এ ক্ষেত্রে প্রস্তুতি নিতে পারি। আর এ লক্ষ্যেই এই অধ্যায়টির অবতারণা।

মানুষের জীবন ও পারিপার্শ্বিকতা অবিরত পরিবর্তনশীল - তদনুযায়ী জীবনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল হবে, এটা সাধারণভাবেই ধারণাযোগ্য। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা মানুষের জীবনকে উন্নত করতেই পরিচালিত হয়। জানতে হয় মানুষের জীবন ও তার সাথে সমন্বিত প্রায় সবকিছু সম্বন্ধেই। কাজেই, কোনো একটি নির্দিষ্ট ফরমেটে পুরো বিষয়টিকে ফেলতে চাওয়াটা এক অর্থে বোকামি। কিন্তু তারপরও কিছু কিছু মৌলিক গুণাবলী প্রায় সকল যুগে, সকল সময়ই প্রয়োজন হবে। আপাতত তার মধ্য থেকেই কিছু বিষয় নিয়ে এখন আমি আলোচনা করবো। কেউ যেন এটা মনে না করেন যে, আলোচিত বিষয়ের বাইরে আর কোনো গুণ বা অর্জন আমাদের প্রয়োজন হবে না। বর্তমানে ও ভবিষ্যতে - বিবর্তন ও প্রগতির সাথে সাথে যা

কেইস রেকর্ডে রোগীদের যে তথ্যগুলো অপরিহার্য

হোমিওপ্যাথি- প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সবচাইতে জটিলতম চিকিৎসা পদ্ধতি। এটা Holistic Medicine System এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ এখানে রোগীর মন, বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ ও শরীর এবং তার সাথে পরিবেশ, পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতাসহ রোগীর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলির সমন্বয়ের সামগ্রিকতা বিচার করে চিকিৎসা করা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে রোগীর লক্ষণকে রোগীর শরীরের বাইরের কোনো বিষয় বিবেচনা না করে তার নিজের জীবনীশক্তি ও আরোগ্য শক্তির বিশৃংখলা ও বাইরের শক্তিগুলোকে তার সেই দুর্বলতার উপর পতিত প্রভাবের মিথষ্ক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আর এ কারণেই এ পদ্ধতিতে রোগীর প্রতিটি লক্ষণকে বিবেচনায় এনে তার মানসিকতা, আবেগ- অনুভূতি, বুদ্ধিবৃত্তি, শারীরিক লক্ষণ ও গঠন ইত্যাদি বিষয়গুলো সামগ্রিকভাবে বিচার করে প্রত্যেক রোগীকে আলাদা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে ঔষধ নির্বাচন করা হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার এই জটিলতার কারণে, চিকিৎসাক্ষেত্রে কয়েকটি দিক থেকে ত্রুটি আসতে পারে। তবে তাকে মূলত তিনটি দিক থেকে ভাগ করে উল্লেখ করা যায়। প্রথমটি হচ্ছে রোগীদের দিক থেকে, দ্বিতীয়টি চিকিৎসকের দিক থেকে আর তৃতীয়টি ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর দিক থেকে।

বাংলাদেশে প্রকৃত হোমিওপ্যাথির চর্চা আসলে খুবই কম। বলা চলে প্রায় হাতে গোনা কিছু লোক- মহাত্মা হানিম্যানের শিক্ষা, তাঁর চিকিৎসা দর্শন, চিকিৎসা ধারা ও পদ্ধতি মেনে চিকিৎসা করেন। কাজেই এ দেশের সাধারণ মানুষের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে ভ্রান্ত, বিকৃত ও অস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এমনকি শিক্ষাজীবনে কিংবা চিকিৎসাজীবনের শুরুতেই ভুল ধারণা থাকায়- নতুন চিকিৎসকগণ আগের সেই অবস্থাটির পুনরাবৃত্তিই ঘটাতে থাকেন। ফলাফলস্বরূপ তাদের কাছে চিরজীবনই অজানা

শিশুদের কেইস টেকিংয়ে অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়

মানুষের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় তার শিশুকাল। কারণ এ সময়ই মানুষের শরীর ও মনের গঠন, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। কাজেই এসময়ের কোনো গভীর প্রভাব, তা উপকারীই হোক আর ক্ষতিকরই হোক, তা তাকে নিজের প্রতিষ্ঠিত বৈশিষ্ট্য হিসাবে চিরদিনই বহন করে যেতে হয়। মানুষের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের ভবিষ্যতও নির্ভর করে- শিশুকালে তার যে সমস্ত রোগ হয় তার চিকিৎসার সফলতা বা ব্যর্থতার উপর। এমন অনেক রোগ (বা বলা চলে সমস্ত ক্রনিক রোগ) আছে যা শিশুকালে দেখা দেয় এবং তার জের সারা জীবন রোগীকে বহন করতে হয়। কিন্তু উপযুক্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় হয়তো সে রোগ নির্মূল হয়ে যেতো এবং শিশুর ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যও হতো নির্মল।

শিশুকালের চর্মরোগের চাপা দেয়ায় (Suppression) তার ভবিষ্যৎ জীবনে হাঁপানী, নিউমোনিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন রকম শ্বাসযন্ত্রের রোগ সৃষ্টি হতে পারে। বার বার কৃমির আক্রমণ, বিভিন্ন এলার্জিক প্রবণতা, সাইনোসাইটিস, টনসিলাইটিস, এডেনয়েড এনলার্জমেন্ট, বার বার ঠাণ্ডা লাগার প্রবণতা ইত্যাদি রোগেরও স্থায়ী আসন তৈরি হতে পারে। আবার শিশুকালে নিউমোনিয়ার চিকিৎসা পাওয়া শিশুর চিরজীবনই ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা, বার বার ইনফেকশন হবার প্রবণতা ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। বাতজ্বরের (Rheumatic Fever) চিকিৎসা নেয়ার পর হৃদযন্ত্রের দুর্বলতা হয়তো কারো কারো সারাজীবনই ভোগ করতে হয়। কিংবা কানের পেছনের গ্ল্যাণ্ড ফোলা ও ইনফেকশন (Parotitis) মেটাসটাসিস হয়ে Ovary (মেয়েদের ডিম্বাশয়) ও Testes (পুরুষদের অণ্ডকোষ) আক্রান্ত হবার দরুন কারোর ভবিষ্যতে সন্তান ধারণক্ষমতা শিশুকালেই ধ্বংস হয়ে যায়। এ সময়ের অ্যালোপ্যাথিক ঔষধের সাইড-ইফেক্টও তার মানসিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি, আবেগ, অনুভূতি ও শারীরিক অবস্থার উপর অত্যন্ত গভীর প্রভাব ফেলে। হোমিওপ্যাথিক দর্শন মোতাবেক, শিশুকালে দেয়া টিকাও (Vaccination)

ফলো-আপ রিপোর্টিং

প্রথমবার চিকিৎসককে দেখানোর পর থেকে শুরু হয় রোগীর উন্নতি অবনতির হিসাব করার পালা। রোগী তার রোগের বিস্তারিত বিবরণ আগেই চিকিৎসককে দিয়েছেন। এবার চিকিৎসক সেগুলোর উপর ভিত্তি করে যে ঔষধ দিয়েছেন তার সঠিক নির্বাচন হলো কিনা, এর মাত্রা-শক্তি ঠিক মতো আছে কিনা, কখন আবার পুনঃপ্রয়োগ করতে হবে- এসমস্ত কিছু নির্ণয় করতে পারবেন পরবর্তীতে রোগীর অবস্থাটির সঠিক বিশ্লেষণের পর। স্বাধীনতা অর্জনের চাইতে যেমন স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন, তেমনি প্রথমবারের উন্নতি রোগের বিরুদ্ধে আসলে যাত্রা শুরু। রোগীর সুস্থতা নির্ভর করে রোগ সারানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ে প্রত্যেকটি সঠিক পদক্ষেপ নেয়ার উপর। এক্ষেত্রে রোগীরও অর্ধেক দায়িত্ব থাকে। কারণ তার রিপোর্টিং ভুল থাকলে, চিকিৎসক শত চেষ্টা করলেও ভুলটা থেকেই যাবে। কাজেই নিচে ফলো-আপের সময়, রোগীর রিপোর্টিংয়ে কী কী বিষয় চিকিৎসককে খেয়াল রাখতে হবে সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে ধারণা দেয়া হলোঃ

১। স্বাস্থ্যের সার্বিক পরিবর্তনঃ

রোগীর অবস্থা মূলত কয়েকভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। প্রথমত যে সমস্ত লক্ষণ নিয়ে রোগী এসেছেন সার্বিকভাবে সেগুলোর ব্যাপারে রোগী ঔষধ দেবার পর কেমন বোধ করছেন। অনেক সময় এমনও হয়, প্রথমবার ঔষধ দেবার পর রোগীর মূল সমস্যাতে হয়তো এত কম সময়ে উন্নতি দেখা দেয় না। কিন্তু খাওয়া, ঘুম, জ্বরের ভাব, দুর্বলতা, চলা-ফেরার স্বাচ্ছন্দ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে রোগী আগের চাইতে কিছুটা আরাম বোধ করতে থাকেন। এরকম হলে তা অবশ্যই চিকিৎসককে জানতে হবে। কারণ এক্ষেত্রে এই ঔষধটাই হয়তো আরো এক বা দুইবার দিলে রোগীর সব সমস্যাই কমে যাবে। এছাড়া আলাদা আলাদাভাবে প্রত্যেকটা লক্ষণ খেয়াল করে, তা তার আগেরবারের

ডা. কেন্টের ঔষধের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণের পর রোগীর সম্ভাব্য ফলাফল নির্ণয়

১। দীর্ঘকালীন রোগের বৃদ্ধি, শেষ পর্যন্ত রোগীর ক্রম অবনতি:

ব্যাখ্যা: এক্ষেত্রে বুঝতে হবে জীবনীশক্তি খুব দুর্বল, ফলে গভীর এন্টি-মায়াজমেটিক ওষুধ সহ্য করতে পারছে না এবং এ কারণে দীর্ঘকালীন রোগ বৃদ্ধি ঘটছে। তার রোগটি আরোগ্য-অসাধ্য ছিলো। ৩০ শক্তির বেশি অর্থাৎ উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করা হয়ে থাকলে, তা করা ঠিক হয়নি। রোগের দরুন শরীরের কোনো যন্ত্রের পরিবর্তন হয়ে গেছে। রোগ আরোগ্যযোগ্য অবস্থায় নেই। এই দীর্ঘকালীন বৃদ্ধিকে এখনই কোনো নিম্ন শক্তির ঔষধ দিয়ে উপশম করা দরকার। নয়তো জীবন সংশয় হওয়ার আশঙ্কা আছে। এরকম অবস্থায় প্রথম থেকেই নিম্ন শক্তির ঔষধ দিয়ে জীবনীশক্তিকে উজ্জীবিত করার চেষ্টা করা ভালো।

২। দীর্ঘকালীন বৃদ্ধি ও শেষে ধীরগতিতে রোগের উন্নতি:

ব্যাখ্যা: ঔষধ প্রয়োগের পর কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ রোগ বৃদ্ধির পর যদি অল্প ধীর গতিতে উপশম হতে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে শরীরের ভিতরে অল্প হলেও টিস্যুর পরিবর্তন শুরু হয়েছে কিন্তু আগের অবস্থাটির মতো এতটা ক্ষতিসাধন হতে পারেনি। তবে ঔষধ প্রয়োগে জীবনীশক্তি আরোগ্যকারী প্রক্রিয়া শুরু করতে সক্ষম হয়েছে। তাই ধীরে ধীরে রোগ আরোগ্যের দিকে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে রোগের গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে প্রয়োগ করতে হবে। ঔষধ ঘন ঘন দেয়া যাবে না- সাবধানে উপযুক্ত সময় অপেক্ষা করে ঔষধ প্রয়োগ করতে হবে। মাঝখানের অপেক্ষার সময়টি কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসও হতে পারে।

ডা. জর্জ ভিথোলকাসের ঔষধ প্রয়োগে সৃষ্ট বাইশটি অবস্থাচিত্র

[ঔষধ প্রয়োগ করার এক মাস পরে রোগীর প্রথম সাক্ষাতে সম্ভাব্য অবস্থা ও তার ব্যাখ্যাগুলো তিনি প্রদর্শন করেছেন]

অবস্থা: ১

রোগী: "আমি সবদিক দিয়েই- বেশ ভালো আছি।"

ঘটনা: সবগুলো লক্ষণের সুস্পষ্ট বৃদ্ধির পর, সুনিশ্চিত উপশম।

ব্যাখ্যা: ঔষধ নির্বাচন একদম সঠিক। ডিফেন্স মেকানিজম শক্তিশালী। আরোগ্যের সম্ভাবনা- ভালো।

প্রেসক্রিপশন: দীর্ঘসময় অপেক্ষা করুন- সম্ভবত ছয় মাস বা তারও বেশি।

অবস্থা: ২

রোগী: "আমি খুব ভালো আছি।"

ঘটনা: কোনো বৃদ্ধি ছাড়াই, অথবা খুব সামান্য বৃদ্ধির পর লক্ষণীয় পরিমাণ হ্রাস। প্রধান সমস্যা, এনার্জি, মানসিক এবং আবেগপ্রবণতা- সবদিক দিয়েই উন্নতি।

ব্যাখ্যা:

১. কোনো প্যাথলজিক্যাল পরিবর্তন হয়নি- এরকম একটি কেইসে, নিখুঁত 'সিমিলিমাম' এবং একদম সঠিক পোটেন্সি, অথবা

২. কেইসটা (উগ্র ক্রনিক কেইসে, বা একটি একিউট কেইসে) শুরু থেকেই তীব্রভাবে বাড়তি অবস্থায় ছিলো।

উভয় ক্ষেত্রেই আরোগ্যের সম্ভাবনা ভালো।

প্রেসক্রিপশন: অপেক্ষা করুন।

যে বিষয়গুলো নিয়ে রোগীকে সতর্ক করে দিতে হবে

শুরুতেই বলেছিলাম, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার ব্যর্থতার পেছনে যে কারণগুলো থাকে, তা তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে- রোগীদের দিক। তাদের দেয়া ভুল তথ্য, অতিরঞ্জন, গোপন করা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো যেমন চিকিৎসককে ভুল পথে টেনে নিয়ে চিকিৎসাকে ব্যর্থ করতে পারে; তেমনি কিছু ব্যাপার আছে, রোগীর কিছু কর্মকাণ্ডের দরুন আরোগ্য ব্যর্থ না হলেও তা অযথা বিলম্ব হয়। চিকিৎসকের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও রোগীর সন্তোষজনক উন্নতি আসে না। এতে একাধারে রোগী যেমন বিরক্ত হন, তেমনি নিরাশ হন কম অভিজ্ঞ ও নতুন চিকিৎসকগণ। তথাপি, এই দীর্ঘসূত্রিতার দায়টি কিন্তু শেষমেষ চিকিৎসকের উপরই বর্তায়। এজন্য যে সমস্ত কারণে সঠিক চিকিৎসা পাওয়া সত্ত্বেও রোগী সুস্থ হতে পারেন না, চিকিৎসার শুরুতেই সেই ব্যাপারগুলোর বিষয়ে রোগীকে সতর্ক করে দেয়া প্রয়োজন। এ কারণে নিচের বিষয়গুলো সম্বন্ধে প্রথমেই চিকিৎসকের সচেতন হওয়া এবং রোগীকেও অগ্রিম জানিয়ে দেয়াটা উত্তমঃ

১। প্রথম কারণ হিসাবে বলা যায়– অনিয়মিত ঔষধ গ্রহণ। চিকিৎসকের দেয়া নির্দেশনা অনুসরণ না করে, ঔষধের ব্যাপারে অসতর্ক থাকলে বা ঔষধ গ্রহণে অনিয়মিত থাকলে রোগীর রোগ সারতে উপযুক্ত সময়ের চাইতে বেশি সময় লাগে। ক্ষেত্র বিশেষে রোগ থেকে মুক্তি পাওয়াও সম্ভব হয়না। কাজেই রোগীকে নিজের ঔষধের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

২। রোগী লজ্জাবশত কোনো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করলে বা রোগীর সমস্যাকে শুরুতে বা চিকিৎসা করার সময়ে বাড়িয়ে বর্ণনা করলে রোগের সত্যিকার চিত্র বোঝা যায় না। সেক্ষেত্রে রোগীর রোগ সারতে সময় বরঞ্চ বেশি প্রয়োজন হয়। কাজেই রোগ থেকে দ্রুত মুক্তি পেতে

রোগীদের প্রশ্ন ও সঠিক জবাব

সমাজে হোমিওপ্যাথির ব্যাপারে কিছু নিতান্ত ভুল, বানোয়াট, ষড়যন্ত্র-প্রভাবিত ও অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা বিরাজিত আছে। চিকিৎসাপদ্ধতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকলে, তাকে অবলম্বন করা রোগীর চিকিৎসাক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা ব্যাপক। আর এটা আশাও করা যায় না যে, রোগীদের বৃহৎ অংশ সেই ভুল ধারণাগুলো দূর করার ব্যাপারে উদ্যোগী হবে, পড়াশুনা করবে, অনুসন্ধান বা গবেষণা করবে। কাজেই, এই ভুল ধারণাগুলো দূর করার দায়িত্ব মূলত চিকিৎসকের। একজন চিকিৎসকই পারেন কার্যকরী, বাস্তবসম্মত ও প্রামাণ্যরূপে এই বিভ্রান্তিগুলো দূর করতে।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ডা. বি. কে. পন্নী স্যার বলতেন, "হোমিওপ্যাথিতে রোগীকেও অর্ধেক ডাক্তার হতে হয়।" এখন ডাক্তারই যদি ডাক্তার না হন, তাহলে রোগী অর্ধেক ডাক্তার তো দূরের কথা- ডাক্তারের মুণ্ডপাতকারীতেই পরিণত হবে। মূলত আগে চিকিৎসকদের শিক্ষিত হতে হবে, এরপর রোগীদের শিক্ষিত করতে হবে।

বহুসময় রোগীরা উক্ত বিষয়গুলো চিকিৎসকদের জিজ্ঞাসা করেন কিংবা কথোপকথনের সময় প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ করেন। চিকিৎসকের উচিৎ অলসতাবশত কিংবা রোগীর সেই ভুল ধারণাগুলো থেকে প্রাপ্ত সম্ভাব্য সাময়িক সুবিধার কথা চিন্তা না করে- রোগীকে প্রকৃত সত্য জানানো। তাতে আখেরে কেবল সেই চিকিৎসকেরই নয়, সমস্ত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকমণ্ডলীরই উপকার সাধন করা হবে। নিচে এ ধরনের কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তরের নমুনা প্রদান করা হলো:

প্রশ্ন: "হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ধীরে কাজ করে"- কথাটা কতটুকু সত্য?

উত্তর: হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ধীরে কাজ করে এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভুল ধারণা। অন্য যে কোনো পদ্ধতির চাইতে এই চিকিৎসা পদ্ধতি দ্রুত কাজ করে। যে জ্বর অন্য পদ্ধতিতে ৩ দিন সময় লাগবে সেখানে হোমিওপ্যাথিতে

কেইস রেকর্ড ফর্মের নমুনা

[এই অংশটি মূলত কেইস টেকিং ফর্মের নমুনা হিসাবে দেয়া হলো। মনে রাখতে হবে, প্রতিটি চিকিৎসকেরই চিন্তা, ভাবনা, কাজের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। এছাড়া প্রতিটি রোগীও স্বতন্ত্র। স্বাতন্ত্র্যতা হোমিওপ্যাথির মূল ভিত্তিগুলোর একটি। কাজেই প্রত্যেকেরই এই কেইস টেকিং নমুনাটাই যথাযথ হবে- ব্যাপারটা এমন নয়। আসলে, একটি পূর্ণ কেইস টেকিংয়ে কী কী বিষয় লক্ষ রাখতে হবে, এটা চিহ্নিত করাটাই এই নমুনাপ্রদানের মূল উদ্দেশ্য। বাস্তবতার প্রাসঙ্গিকতাকে বিবেচনা করে, নিচের কেইস টেকিং নমুনাটি রোগীকে উল্লেখ করে বলা হয়েছে- এমনভাবে লেখা হলো।]

(ফরম পুরণ করার আগে মনোযোগ দিয়ে নিচের লেখাগুলো পড়ে নিন)

আপনার রোগ ও আপনার নিজের সম্বন্ধে যে তথ্য আপনি প্রদান করবেন তার উপর ভিত্তি করেই প্রধানত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ নির্বাচন করা হবে।

ভালো চিকিৎসা দেয়ার জন্য আপনি যে যে অসুবিধা অনুভব করছেন তা নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করা চিকিৎসকের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু হোমিওপ্যাথিতে প্রেসক্রিপশন করার জন্য পুরো মানুষটাকে বিবেচনা করতে হয়, তাই ব্যক্তি হিসাবে আপনার বৈশিষ্ট্যগুলোও আমাদের জানতে হবে এবং বিভিন্ন ঘটনায় আপনার প্রতিক্রিয়া, আপনার অতীত এবং পারিবারিক ইতিহাস এবং আপনার মানসিক গঠনও আমাদের জেনে নিতে হবে ।

এই ফর্মে উল্লেখিত প্রত্যেকটি প্রশ্নই হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসাক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্ণাঙ্গ তথ্য জানানোর জন্য আপনাকে এমন অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হতে পারে, যা হয়তো বর্তমান রোগের সাথে সম্পর্ক নেই বলে আপনার মনে হবে। কিন্তু হতে পারে সেটাই আপনার নিখুঁত হোমিওপ্যাথিক ঔষধ